বিদ্রোহী রণক্লান্ত

নজরুল-জীবনী

গোলাম মুরশিদ



নিজের নামের থেকেও বেশি পরিচিত তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে। জন্ম একটি প্রত্যন্ত গ্রামের অতিদরিদ্র এবং স্বল্পশিক্ষিত পরিবারে। এ হেন পরিবেশে জন্মে এবং দারুণ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে কী করে তিনি বলতে পারলেন তাঁর সামনে হিমালয়ও নতশির? প্রবল ইংরেজ সরকারকে অগ্রাহ্য করে কী করে কবিতা লিখে কারারুদ্ধ হলেন তিনি? কী করে হতে পারলেন, যা তিনি হয়েছিলেন? লেটোর দলে গান লেখায় যাঁর হাতেখড়ি, তিনি কী করে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বাংলা গান রচনা করলেন পরবর্তীকালে? ভাবলে বিস্মিত হতে হয় কী করে তিনি একই হাতে লিখলেন ইসলামি গান, কীর্তন আর শ্যামাসংগীত। তাঁর সম্পর্কে এন্তার লেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে রটনা যত শোনা যায়, ঘটনা তত জানা যায় না। তাঁর সত্যিকার জীবন-কাহিনি ঢাকা পড়েছে শত কিংবদন্তির ঘন ধোঁয়াশায়। অতিরঞ্জিত নজরুল নন, কিংবদন্তির নজরুল নন—এই গ্রন্থে নজরুলকে দেখা যাবে তাঁর সত্যিকার স্বরূপে। কবি ও সংগীতকার নজরুলকে ছাড়াও দেখা যাবে এক বিবর্তনশীল প্রতিভাকে, একজন রক্তমাংসের মানুষকে। জানা যাবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন এবং তাঁর রোগ সম্পর্কে নতুন কথা।



আলোকচিত্র : খালেদ সরকার

গোলাম মুরশিদ

ব্যাপক গবেষণা এবং বিবিধ গ্রন্থের জন্যে গোলাম মুরশিদ উভয় বাংলায় সুপরিচিত। বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতি, উনিশ শতকের বঙ্গদেশ, বঙ্গীয় রেনেসন্স, মানবীবিদ্যা, ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ। কিন্তু তাঁর তিরিশটি গ্রন্থের মধ্যে *আশার ছলনে ভুলি* সমগ্র বাংলা জীবনী-সাহিত্যে একটি মাইলফলক বলে বিবেচিত হয়েছে। এতে কিংবদন্তির ধূম্রজাল থেকে মুক্তি দিয়ে লেখক মাইকেল-জীবনকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। *বিদ্রোহী রণক্লান্ত : নজরুল-জীবনী*ও অনুরূপ। তাঁর *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*কে সমালোচক বলেছেন 'মহাগ্রন্থ'। *রেনেসন্স বাংলার রেনেসন্স* গ্রন্থটি বঙ্গীয় রেনেসন্স সম্পর্কে একেবারে নতুন মূল্যায়ন। পুরোনো বাংলা গদ্যের ইতিহাস রচনায়ও তাঁর অবদান অসামান্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বিলেতে বাঙালিদের ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ে তাঁর গবেষণা। তাঁর আর-এক অসামান্য কাজ *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান* সম্পাদনা।

প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল

বিদ্রোহী রণক্লান্ত
নজরুল-জীবনী

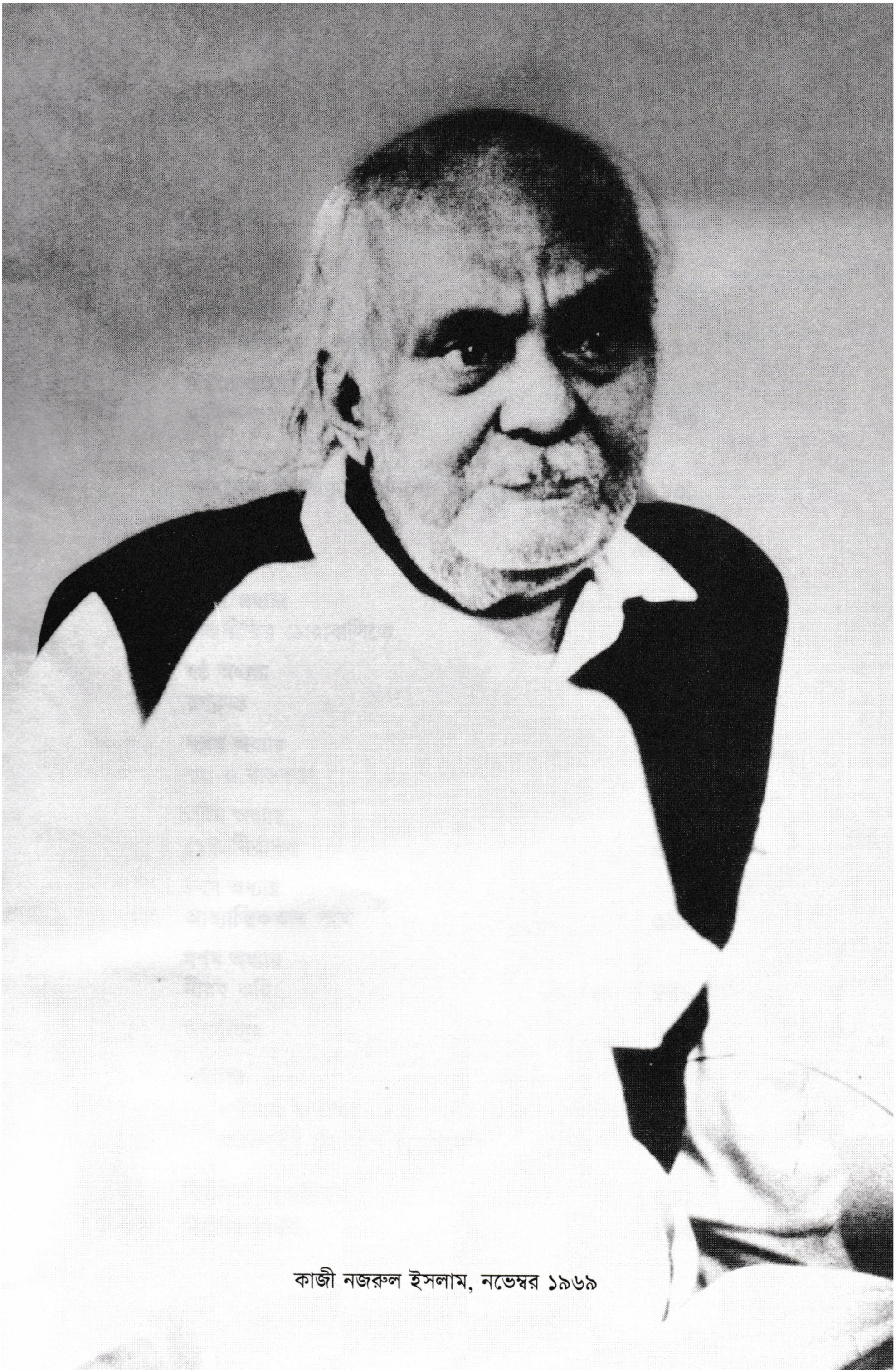
বিদ্রোহী রণক্লান্ত

নজরুল-জীবনী

গোলাম মুরশিদ



প্রথমা



কাজী নজরুল ইসলাম, নভেম্বর ১৯৬৯

উ ৎ স র্গ

এলিজাকে

'দীনতা আমার যতো, গ্লানি যতো মম
ক্ষম, হে মম, ক্ষম'

মুরশিদ

ভূমিকা ও কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

নজরুল ইসলাম সম্পর্কে অপ্রকাশিত দলিল-পত্রাদি, বলতে গেলে, পাওয়াই যায় না। আর প্রকাশিত বইপত্র থেকে তাঁর জীবনের ঘটনা যতোটা জানা যায়, রটনা জানা যায় তার থেকে ঢের বেশি। যেমন, একজন লিখেছেন যে, নজরুল হুগলি জেলে যখন অনশন ধর্মঘট করছিলেন, তখন মায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিলো। কেবল তাই নয়, কবি তাঁর মায়ের পদচুম্বন (কদমবুসি) করেছিলেন। আর-একজন লিখেছেন যে, নজরুল নির্বাচন করার জন্যে টাকা পেয়ে মোটা রকমের বাজার করে কৃষ্ণনগরে ফিরেছিলেন এবং এই লেখক কবিকে শিয়ালদা স্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তুলে দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। এ ধরনের বানানো কথা এবং শোনাকথা-নির্ভর রচনা কবির মিথ্যে ও বিকৃত ভাবমূর্তি অঙ্কন করে।

কবি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান ও প্রাণোচ্ছল চরিত্রের মানুষ। তাঁর যেসব 'জীবনী' লেখা হয়েছে, সেগুলোর বেশির ভাগই বীরপূজামূলক এবং অতিরঞ্জিত। এসব বইপত্র তাঁকে স্পষ্ট করে অথবা সঠিকভাবে দেখতে সাহায্য করে না। আমি তাই এইসব বইপত্রের তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করে ব্যবহার করেছি। তা ছাড়া, আমি তাঁকে দেখেছি সদা-পরিবর্তনশীল এক প্রতিভা হিসেবে। সেই সঙ্গে মনে রেখেছি যে, তিনি সীমাবদ্ধতাপূর্ণ একজন রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন।

এই কাজে বিভিন্নজন তাঁদের পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল, অধ্যাপক স্বরোচিষ সরকার এবং বিধানচন্দ্র পাল আমার লেখা পড়ে তাঁদের অভিমত দিয়েছেন। বিধানচন্দ্র পাল আমাকে নির্ঘণ্ট তৈরি করতেও সাহায্য করেছেন। ড জ্যোতিপ্রকাশ দত্তও একটি অধ্যায় পড়ে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছিলেন। অধ্যাপক শফি আহমদ প্রুফ দেখতে সাহায্য করেছেন। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

নজরুল সরকারীভাবে বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি' হয়েছিলেন কিনা—সে সম্পর্কে আমাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন মোহাম্মদ আরিফ খান।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক ড এনামুল হক আমাকে একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তা ছাড়া তিনি ১৯৬৯ সালে তাঁর তোলা কবির দুটি ফোটোগ্রাফ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কল্যাণী কাজী-সম্পাদিত *Nazrul: The Poet Remembered* গ্রন্থ থেকে কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান আলোকচিত্র ও প্রতিলিপি ব্যবহার করেছি। এই দলিলগুলো কবিকে বুঝতে অসাধারণভাবে সহায়তা করে। শ্রীমতী কল্যাণী কাজীকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সূফী জুলফিকার হায়দারের *নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়* এবং খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীনের *যুগস্রষ্টা নজরুল* গ্রন্থ থেকে কবির হাতের লেখার কয়েকটি প্রতিলিপি নিয়েছি। তাঁদেরও আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশিষ্ট হিসেবে ব্যবহৃত 'নজরুলের কী রোগ হয়েছিলো?' প্রবন্ধটি লন্ডনের সেন্ট্রাল মিডলসেক্স হসপিটালের কনসাল্টেন্ট ডাক্তার মুহাম্মদ নূরুল হকের লেখা। তিনি লেখাটি এই বইতে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছেন সাজ্জাদ শরিফ, মাইনুল ইসলাম, আলমগীর রহমান এবং ড উদয়শঙ্কর বিশ্বাস। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নজরুল ইন্সটিটিউট লাইব্রেরির কর্মকর্তা তামান্না আনোয়ার বিভিন্ন সময়ে বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার ধন্যবাদ।

এ বই প্রকাশের ব্যাপারে প্রথমার পক্ষ থেকে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন জাফর আহমদ রাশেদ।

এ বইতে অনুসৃত নাত্যাধুনিক বানান-রীতি আমার নিজস্ব—প্রথমার বানান-রীতি থেকে যা আলাদা।

গোলাম মুরশিদ
লন্ডন, জানুয়ারি ২০১৮

প্রথম অধ্যায়

জন্ম, পরিবার ও পরিবেশ

কারও জীবনী পুনর্নির্মাণ করার জন্যে যেসব তথ্য অত্যাবশ্যক, নজরুল ইসলামের বেলায় তেমন অনেক কিছু পাওয়া যায় না। তাঁর জন্মের পর এক শো বছরেরও বেশি অতিবাহিত হয়েছে, আজও, বিশেষ করে, তাঁর প্রথম জীবনের বহু ঘটনা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হঠাৎ কোনো সূত্র থেকে অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কারের ফলে এ অন্ধকার কেটে যাবে—সে সম্ভাবনা বস্তুত নেই বললেই চলে। তাঁর পারিবারিক পটভূমিও কুয়াশা-ঢাকা। তিনি এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি, যে-পরিবারের বিশেষ কোনো সামাজিক পরিচিতি ছিলো। তাঁর এমন আত্মীয়স্বজনও ছিলেন না, যাঁদের কাছ থেকে তাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠার অভ্রান্ত এবং অত্যন্ত দরকারী তথ্যগুলি জানা যেতো। এমন কি, তিনি যখন স্মৃতিশক্তি এবং কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, তখন তাঁর দুই সন্তান বালক মাত্র। ফলে তাঁরা তাঁদের পিতার সত্যিকার জীবন-কাহিনী সামান্যই জানতেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কবিপত্নী প্রমীলাও স্বামীর প্রথম জীবনের কথা তেমন জানতেন না, কারণ পৈতৃক পরিবারের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগ কিশোর বয়স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো। বস্তুত, নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে নজরুল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ এবং অভ্রান্ত জীবনী পুনর্গঠন করা এক প্রকার অসম্ভব।

এ কাজ আরও কঠিন হয়ে ওঠে তাঁর সম্পর্কে বহু শোনা-কথা প্রচলিত থাকায়। অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। ফলে তাঁর অসংখ্য বন্ধু জুটে ছিলো। এই বন্ধুদের কেউ কেউ তাঁর সম্পর্কে বহু গালগল্প বলে গেছেন। অনেকে লিখেওছেন। এসব গালগল্প বিচিত্র রঙে রঞ্জিত, কারণ বীরপূজা এবং অতিশয়োক্তি বাঙালিদের দুই প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এসব গল্পের অনেক কিছু পরস্পরবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কবির জনপ্রিয় জীবনীগুলিতে এগুলো বেশ

জায়গা করে নিয়েছে। বস্তুত, তাঁর জীবনীগুলোর অধিকাংশ তাই আংশিকভাবে কিংবদন্তী-নির্ভর। যে যা বলেছেন, যাচাই না-করেই কোনো কোনো জীবনী-লেখক সেসব শোনা-কথা দিয়ে জীবনীর কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। এর ফলে সত্যিকার নজরুল চাপা পড়েছেন ভ্রান্তির জঞ্জালে।[১] সেই আবর্জনা থেকে মুক্ত করে তাঁর সত্যিকার জীবনী রচনা করা আজ প্রায় অসাধ্য ব্যাপার।

নজরুলের ধর্মমতও তাঁর নিরাসক্ত জীবনী রচনার পক্ষে একটা মস্ত বড়ো অন্তরায়। যাঁরা এককালে তাঁকে 'কাফের' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, তাঁরাই এখন ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে উৎসাহিত হয়ে কবিকে পাক্কা মুসলমান বলে অঙ্কন করছেন। তা ছাড়া, বহু জীবনী-লেখক নিরাসক্তভাবে তাঁর জীবনী লেখার পরিবর্তে, তাঁকে নিয়ে বীরপূজা করেছেন। তাঁদের জীবনীগুলোতে তাঁরা কবির যে-জীবন চিত্রিত করেছেন, তা অতিরঞ্জিত এবং অবিশ্বাস্য। তদুপরি, অনেকে তাঁর পরিণত জীবনের গুণাবলী আরোপ করে তাঁর প্রথম দিকের জীবনী রচনা করেছেন।

সাধারণ মানুষের বিচারে যা প্রামাণ্য মাপকাঠি, তা দিয়ে নজরুল ইসলামকে বিচার করা সংগত হবে না। কারণ সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যা সম্ভব-অসম্ভব এবং স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়, তাঁর ক্ষেত্রে তা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। যেমন, স্কুলে কোনো একজন কতোটুকু পাটীগণিত-বীজগণিত-ইংরেজি-বাংলা-ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি শিখে কতোটা ভালো ফলাফল করেছে, সেটা একজন সাধারণ লোকের জন্যে একটা প্রয়োজনীয় খবর। অপর পক্ষে, নজরুল ইসলামের মতো সত্যিকার প্রতিভাবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নয়। বরং জীবনের পথে পথে এই ধরনের প্রতিভাবান মানুষ আর পাঁচজন মানুষের তুলনায় ভিন্নভাবে বড়ো হয়ে ওঠেন, সেটাই মনে রাখা দরকার। এবং সেভাবে তাঁদের প্রতিভার বিকাশকে ব্যাখ্যা করা উচিত।

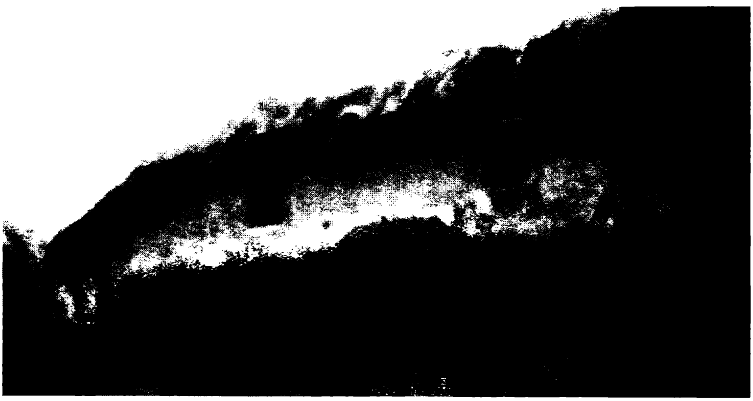
একটা পুরোনো দৃষ্টান্ত নতুন করে দেওয়া যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত। স্কুল-পালানো ছেলে ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও, তিনি রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন। বিস্তারিত তথ্য না-জেনেও এর একটা স্থূল ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তাঁর জন্ম হয়েছিলো কলকাতার অত্যন্ত অভিজাত একটি পরিবারে। এ পরিবারের শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিলো প্রায় তুলনাহীন। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না-হয়েও তাই সেই পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে একটি ছেলের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার বিশ্বাসযোগ্য একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এক প্রান্তবর্তী

---

১. পরস্পর-বিরোধী শোনা-কথা কিভাবে সত্যিকার নজরুলকে আড়াল করে ফেলেছে, তা নিয়ে একটি বইও লিখেছেন একজন লেখক—নীরদবরণ হাজরা। বইটির নাম *এক নজরুল, সহস্র সংশয়* (কলকাতা : বুলবুল প্রকাশন, ১৯৯৯)।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে দুক্ষু[২] মিয়া ওরফে দুখু মিয়া কী করে নজরুল ইসলাম হয়ে উঠলেন, সে এক অজানা রহস্য। তাঁর জীবনী-লেখকরা সেই রহস্যের বিশ্বাসযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা দেননি।

দুখু মিয়ার জন্ম কলকাতার মতো শিক্ষার আলোকে উজ্জ্বল এবং ধনসম্পদে পরিপূর্ণ নগরীতে নয়, এমন কি, বর্ধমানের মতো মফস্বল শহরেও নয়। তাঁর জন্ম বর্ধমান জেলার একটি অজ গ্রাম—চুরুলিয়ায়। যে-পরিবেশ এবং পরিবারে তাঁর জন্ম, সেখানে রুপোর চামচ মুখে নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। সত্যিকার অর্থে, তাঁর পিতামাতার পরিবার ছিলো অত্যন্ত দরিদ্র। ১৯৫৭ সালে কবিকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজিত তথ্যচিত্রে খড় দিয়ে ছাওয়া যে-মাটির ঘরটি দেখা যায়, সেই ছোটো ঘরটিতে দুই স্ত্রী আর সন্তানদের নিয়ে বাস করতেন নজরুলের পিতা। নজরুলের পৈতৃক বাড়ির যে-চিত্রটি দেখা যাচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সেটি তাঁর জন্মের কয়েক দশক পরে দোতলা করে নির্মিত। সম্ভবত তাঁর দু ভাই সাহেবজান এবং আলী হোসেনের তৈরি করা। নজরুলের পিতা মাজার এবং মসজিদের কাজ থেকে যৎসামান্য আয় করতেন বলে মনে হয়।[৩] তা ছাড়া, তাঁর



এই বাড়িতে নজরুল জন্মেছিলেন, কিন্তু তাঁর জন্মের সময় বাড়ির চেহারা এমনটা ছিলো না। এ চেহারা নেয় অর্ধ শতাব্দীর ধরে বারবার সংস্কারের পর

২. নজরুলকে তাঁর বড়ো ভাই সাহেবজান দুখু বলে ডাকতেন না, বরং ডাকতেন দুক্ষু বলে।—সূফী জুলফিকার হায়দার, *নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়* (ঢাকা বাংলা একাডেমি, ১৯৬৫), পৃ. ১৮৬। আমরা প্রচলিত 'দুখু' শব্দটাই ব্যবহার করছি।

৩. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, *যুগস্রষ্টা নজরুল* (ঢাকা : অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটী প্রেস, ১৯৫৭), পৃ. ৪-৫।

আয়ের একটা অংশ আসতো জমিজমা থেকে। তবে সহায়-সম্পত্তি তাঁর এতোই কম ছিলো যে, তিনি মারা যাওয়ার পর ন-দশ বছরের নজরুলকেও রোজগারের পথ বেছে নিতে হয়েছিলো।

নজরুলের পরিবার দরিদ্র ছিলো, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়; কিন্তু সে পরিবার কতোটুকু শিক্ষিত ছিলো, তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। তাঁর সম্পর্কীয় চাচা (নজরুলের পিতার চাচাতো ভাই) বজলে করিম লেখাপড়া খানিকটা জানলেও[৪], পিতা ফকির আহমদ শাস্ত্রীয় আরবি ছাড়া অন্য লেখাপড়া কী জানতেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। নজরুলের বড়ো ভাই সাহেবজান এবং ছোটো ভাই আলী হোসেন ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া লেখাপড়া সামান্যই শিখেছিলেন। এ হেন পরিবারে জন্ম নিয়ে দুখু মিয়া কী করে বাইশ-তেইশ বছর বয়সে অকস্মাৎ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্য-গগনে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিলেন, আপাতদৃষ্টিতে তার কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। প্রকৃত পক্ষে, যে-পরিবেশ এবং পরিবারে তাঁর জন্ম, তার কোনোটাই তিনি যা হয়েছিলেন, তা হবার পক্ষে অনুকূল ছিলো না।

বর্ধমান একটি হিন্দু-প্রধান জেলা। এ জেলায় ১৯০১ সালে জনসংখ্যার শতকরা ৮১.৩ জন ছিলো হিন্দু; আর শতকরা ১৭.১ জন মুসলমান। কিন্তু নজরুলের জন্ম যে-রানীগঞ্জ মহকুমায়, সেখানে মুসলমানদের অনুপাত ছিলো আরও কম। এ মহকুমায় হিন্দু এবং মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ৩ লাখ ২৭ হাজার আর ২৪ হাজার ১১৫ জন। অর্থাৎ মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো শতকরা মাত্র ৭.৩ জন।[৫] তবে যে-চুরুলিয়া গ্রামে নজরুলের জন্ম, সে গ্রামে মুসলমানদের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে কিছু বেশি ছিলো। কারণ সে গ্রামে কিছু মুসলমান আয়মাদার বাস করতো।[৬] জে. সি. কে. পীটারসন তখনকার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখেছেন যে, এই মুসলমানরা কোথা থেকে এসে এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলো, তার ইতিহাস অজ্ঞাত। তবে এই আয়মাদার পরিবারগুলির কোনো কোনোটা তাদের বাড়ি এবং মসজিদ তৈরি করার কাজে যে-ইট ও পাথর ব্যবহার করেছিলো, তা এসেছিলো গ্রামের এক কোণে অবস্থিত রাজা নরোত্তম-

---

৪. বজলে করিম ফারসিতে কবিতা লিখতে পারতেন বলে উল্লেখ করেছেন খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন।—*যুগস্রষ্টা নজরুল*, পৃ. ৫। মঈনুদ্দীন অবশ্য কোনো প্রমাণ উপস্থিত করেননি। অতিরঞ্জন হওয়া অসম্ভব নয়।

৫. *Census of India, Vol. VIB, Pt III* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902), p. 18.

৬. *The Imperial Gazetteer of India 1908, Vol. IX* (Oxford: Clarendon Press, 1908), p. 99.

নির্মিত ভেঙে-পড়া দুর্গ থেকে।[৭] মনে হয় যে, হিন্দু-প্রধান এলাকা হলেও, চুরুলিয়া গ্রামে একটা মুসলিম মহল্লা ছিলো। সেই পাড়ার বাসিন্দাদের চাহিদায়ই সেখানে ছোটো হোক, বড়ো হোক, একটি মক্তবও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। মসজিদও। এক কথায়, শিক্ষায় অনগ্রসর একটি হিন্দুপ্রধান গ্রামের মুসলিম পাড়ায় নজরুলের জন্ম।

এই গ্রামের সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন এবং শহরের নাম আসানসোল। গ্রাম থেকে ঠিক দক্ষিণে নয়—খানিকটা দক্ষিণ-পশ্চিমে—এই স্টেশনের অবস্থান ছিলো সরল রেখার মাপে সাড়ে ১৪ কিলোমিটার দূরে। আর, গ্রামের দক্ষিণ-পুবে অবস্থিত রেল স্টেশন ও শহরের নাম রানীগঞ্জ, যা ছিলো আসানসোলের তুলনায় খানিকটা বেশি দূরে—প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে। শিল্প-শহর হিসেবে রানীগঞ্জ সুপরিচিত ছিলো। এ শহরে অনেকগুলো কয়লা, কাগজ এবং তেলের কারখানা ছিলো। জনসংখ্যার দিক দিয়ে রানীগঞ্জ ছিলো আসানসোলের চেয়ে সামান্য বড়ো—তখনকার বর্ধমানের আটটি সবচেয়ে বড়ো শহরের মধ্যে একটি। প্রায় ১৬ হাজার লোক বাস করতো এখানে।[৮] রানীগঞ্জের আর-এক পরিচয় হলো: এটি ছিলো চুরুলিয়ার তখনকার মহকুমা শহর (মহকুমা আসানসোলে স্থানান্তরিত হয় ১৯০৬ সালে।) এ গেলো চুরুলিয়া গ্রামের দক্ষিণ দিকের কথা।

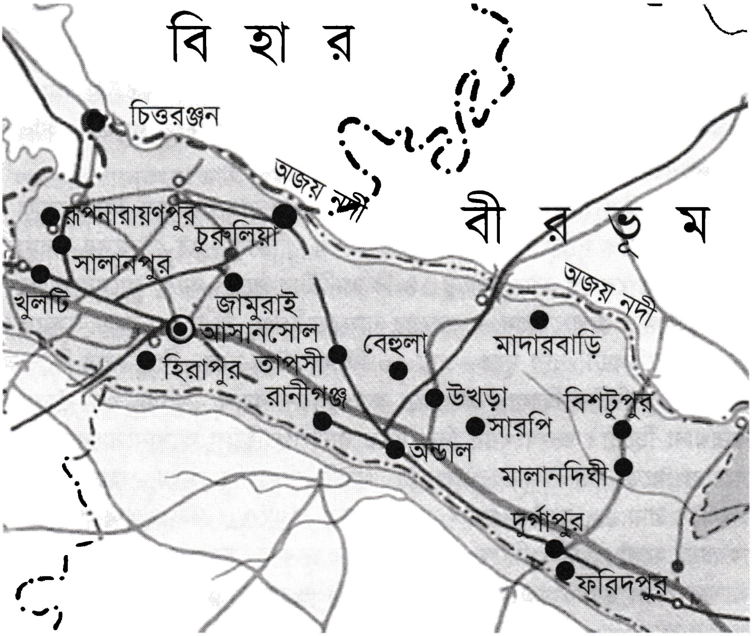
অপর পক্ষে, এ গ্রামের উত্তর দিকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে অজয় নদী এবং বর্ধমান জেলার সবচেয়ে উত্তরের সীমানা। নদীর ওপারেই বিহারের ঝাড়খণ্ড। সেদিক দিয়ে দেখলে, এই শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবির জন্ম বঙ্গদেশের একেবারে পশ্চিম সীমান্তে, অল্পের জন্যে তিনি বিহারী বলে পরিচিত হননি। অজয় নদীর ওপারে উত্তর-পুবে বীরভূম জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত। চুরুলিয়ার পুব দিকে প্রায় এক শো কিলোমিটারের মধ্যেও কোনো শহর ছিলো না। আর এই গ্রামের পশ্চিম দিকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে বর্ধমানের পশ্চিম সীমানা। সেই নিঃশহর এলাকায়ও উল্লেখযোগ্য কিছু ছিলো না।

কেবল শহর থেকে দূরত্ব দিয়ে চুরুলিয়া গ্রাম কতোটা অনুন্নত ছিলো, তা বোঝানো যায় না। সেটা খানিকটা বোঝা যায় আর-একটা তথ্য থেকে—এ গ্রামে অথবা এর কাছাকাছি কোনো গ্রামে একটাও মাধ্যমিক স্কুল ছিলো না—অনেক বছর পরে পর্যন্ত মাধ্যমিক স্কুল ছিলো রানীগঞ্জ আর আসানসোলে।

---

৭. J. C. K. Peterson, *Bengal District Gazetteer, Vol. XXIII (Burdwan)* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1910), p. 172.

৮. ১৫৮৪১ জন। আসানসোল শহরের লোকসংখ্যা ছিলো সাড়ে চোদ্দো হাজার।



বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণার মানচিত্র

এই গ্রামের রাস্তাঘাট এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থা কেমন ছিলো, সে কেবল অনুমান-সাপেক্ষ।

এই ভৌগোলিক এবং সামাজিক পরিবেশে নজরুলের জন্ম। এই পরিবেশেও তাঁর পারিবারিক পটভূমি আর-পাঁচজনের তুলনায় উন্নত থাকতে পারতো, কিন্তু তা ছিলো না। প্রকৃত পক্ষে, তিনি যে-পরিবার ও পরিবেশে জন্মেছিলেন আর যৌবনে তিনি যা হয়েছিলেন, তার মধ্যে আদৌ কোনো মিল ছিলো না। ফলে অনেকে তাঁর যৌবনকালের খ্যাতি দিয়ে তাঁর পরিবার এবং বাল্যকালের পরিবেশকে বিনির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর পরিবারের ওপর তাঁরা সেই গৌরব আরোপ করতে চেষ্টা করেছেন, যে-গৌরব সত্যিকার অর্থে সে পরিবারের তখন ছিলো না। নজরুল আসলে পরিবার-নিরপেক্ষ একজন মানুষ—স্বগঠিত, স্বাবলম্বী, স্বাধীন, স্বধন্য। তাঁকে অতিমানব বললেও খুব একটা বাড়িয়ে বলা হয় না।

১৯২১ সালে—তখনও তিনি অনেকটা অপরিণত যুবক—তাঁর বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে 'আয়মা-দার' বিশেষণ দিয়ে তিনি তাঁর পিতাকে গৌরবান্বিত করতে

চেয়েছিলেন।[৯] আয়মাদার বিশেষণ দিয়ে পিতাকে বড়ো করার এই যে-প্রয়াস, তা ছিলো নির্ভেজাল অতিরঞ্জন—যেমন অতিরঞ্জন ছিলো অপ্রকৃতিস্থ হওয়ার পর নিজের নামের আগে 'সৈয়দ' লেখা।[১০] পিতাকে অভিজাত হিসেবে চিত্রিত করার কারণে কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা-প্রতিম এবং দরদী বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর সমালোচনা করেছিলেন।[১১] নজরুলের পূর্বপুরুষের কেউ হয়তো আয়মাদার ছিলেন, কিন্তু তাঁর পিতা ফকির আহমদ আয়মাদার ছিলেন না। তা ছাড়া, আয়মাদার কথাটা এমন কিছু গৌরবেরও নয়। উইলিয়াম হান্টার 'আয়মা'র ব্যাখ্যা দিয়ে যা বলেছেন, তা থেকে মনে হয়, ধর্মীয় কারণে দেওয়া নয়, এমন কি, নিষ্করও নয়, বরং নামে মাত্র করের বিনিময়ে আবাদ করার জন্যে প্রদত্ত পতিত জমিকে বলে আয়মা। অর্থাৎ, 'আয়মাদার' কথাটার মানে পতিত জমি আবাদকারী।[১২]

ইংরেজ আমলে এ রকম সম্পত্তি দেওয়ার কোনো রীতি ছিলো না। তার অর্থ চুরুলিয়ার আয়মাদারেরা এ পতিত জমি পেয়েছিলেন নবাবী আমল অথবা মোগল-পূর্ব আমলে। আয়মা ধর্মীয় কারণে প্রদত্ত লাখেরাজ সম্পত্তি নয়। নজরুলের পূর্বপুরুষদের কেউ 'কাজী' ছিলেন বলে ধারণা করি। তাই তাঁর পরিবারিক পদবী সম্ভবত 'কাজী' ছিলো। তবে বাল্যরচনাসমূহের ভণিতায় নজরুল কোথাও 'কাজী' উপাধি ব্যবহার করেননি। তাঁর চাচা বজলে করিম লেটো দলের অধিকারী ছিলেন। নিজের গ্রাম এবং ধারে-কাছের গ্রামে তাঁর পরিচিতি ছিলো। কিন্তু তিনিও নামের আগে অথবা পরে 'কাজী' উপাধি ব্যবহার করেছেন বলে দেখা যায় না। তা ছাড়া, কাজীত্বের সঙ্গে আয়মাদারির কোনো সম্পর্ক নেই।

---

৯. নজরুল নিজে *বিজলী* পত্রিকায় (২২ জুলাই ১৯২১) 'কবি-বরের প্রতিবাদ' শিরোনামে একটি চিঠি লিখে অস্বীকার করেছেন যে, বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রটি তাঁর রচিত নয়, অথবা তাঁর অনুমতিক্রমেও রচিত নয়। *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড* (দ্বিতীয় সংস্করণ: কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫), পৃ. ৫১০-১১।

১০. নজরুলের অটোগ্রাফ দ্রষ্টব্য : কল্যাণী কাজী সম্পাদিত *Nazrul: The Poet Remembered* (New Delhi: Wisdom Tree, 2009), p. 179.

১১. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা* (৮ম মুদ্রণ; কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯৫), পৃ. ৭৭।

১২. *A Statistical Account of Bengal, Vol. IV* (London: Truner & Co, 1876), p. 77. বর্ধমান জেলায় তখন ছোটোবড়ো মিলে ১৭০৫টি আয়মা ছিলো বলে হান্টার উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও লিখেছেন যে, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সেকশন ৯-এর রেগুলেশন ৮ অনুযায়ী পূর্ব-প্রদত্ত এই আয়মাগুলোর পুরো নাম মালগুজারি আয়মা অর্থাৎ খাজনা দিতে হতো এমন আয়মা।

নজরুলের পূর্বপুরুষদের কেউ আয়মাদার থাকুন আর না-ই থাকুন, তার চেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সংসার চালানোর মতো যথেষ্ট সহায়-সম্পত্তি ফকির আহমদের ছিলো কি না। আগেই আভাস দিয়েছি, ছিলো না। বাল্যকালে দারিদ্র্যের সঙ্গে নজরুল যে-রকম কঠোর লড়াই করেছেন, তা থেকে সহজেই এই ধারণা জন্মে যে, তাঁর পিতা মোটেই সচ্ছল ছিলেন না, বরং দরিদ্র ছিলেন।

দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও, নজরুলের পিতা দুই বিয়ে করেছিলেন। কেন করেছিলেন, তা জানা যায় না। হতে পারে প্রথম স্ত্রীর যথাসময়ে সন্তান হয়নি বলে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত কোন স্ত্রীর কয়টি সন্তান হয়েছিলো, তা সঠিকভাবে কেউ উল্লেখ করেননি। এ থেকেও বোঝা যায়, তাঁদের পরিবার কতো অপরিচিত এবং সামাজিকভাবে সাধারণ ছিলো। সবাই দীর্ঘজীবী না-হলেও[১৩], বলা হয়ে থাকে যে, ফকির আহমদ সাত পুত্র এবং দুটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর আগেই তাঁর এক স্ত্রী মারা যান, যাঁর নাম জানা যায় না। অন্য স্ত্রীর নাম ছিলো জাহেদা খাতুন। বেশির ভাগ জীবনীকার ধরে নিয়েছেন যে, নজরুল তাঁরই সন্তান।[১৪] এই মায়ের গর্ভে নজরুল-সহ তিন পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়েছিলো বলে আজহারউদ্দীন খান দাবি করেছেন।[১৫]

জাহেদা খাতুন মোটামুটি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন এবং ১৯২৮ সালে মারা যান।[১৬] স্বামী মারা যাওয়ার পর স্বামীর চাচাতো ভাই বজলে করিমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। ঠিক কখন, তা কেউ উল্লেখ করতে পারেননি। তবে দু-এক বছরের মধ্যে নিশ্চয়। এই বিয়ের ফলে নজরুল মায়ের ওপর অভিমান করে দূরে সরে গিয়েছিলেন বলে কোনো কোনো জীবনীকার জল্পনাকল্পনা করেছেন।[১৭] কিন্তু এটা নিতান্তই অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো। সৈন্য বাহিনী থেকে ফিরে এসেও ১৯২০ সালের প্রথম তিন মাসের মধ্যে কবি দুবার চুরুলিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। কাজেই মায়ের সঙ্গে মান-অভিমান অথবা মনোমালিন্য হয়ে

---

১৩. ফকির আহমদ মারা যান, যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স মাত্র সতেরো-আঠারো ছিলো বলে অনুমান করা যায়। তার অর্থ তিনি মারা যান যখন তাঁর বয়স খুব সম্ভব চল্লিশের কোঠায়।

১৪. প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, জাহেদা খাতুন ছিলেন নজরুলের বিমাতা।—*কাজী নজরুল* (তৃতীয় সং; কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৭৭), পৃ. ১৩।

১৫. আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল* (তৃতীয় সং; কলকাতা : ডি এম লাইব্রেরী, ১৯৫৮), পৃ. ৩।

১৬. অরুণকুমার বসু, *নজরুল-জীবনী* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০), পৃ. ৫।

১৭. আজহারউদ্দীন খানের বরাত দিয়ে অরুণকুমার বসু এ তথ্য দিয়েছেন। পৃ. ৫।